বাংলাদেশের বিদ্যমান ডিজিটাল আইন সম্পর্কে আর্ন্তজাতিক সংস্থার যৌথ বিবৃতি

এক্সেস নাও, আর্টিকেল নাইনটিন, হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ, পেন ইন্টারন্যাশনাল, রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস্ ও টেক গ্লোবাল ইন্সটিটিউট

২৫ ফেব্রুয়ারি,২০২৫

বর্তমানে বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে এক কঠিন সময় পার করছে। কেননা সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য সুরক্ষাসহ সামগ্রিক রাষ্ট্রকাঠামোই কাঠামোগত এবং কৌশলগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। যেসবের কেন্দ্রে রয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এ সরকারের ডিজিটাল পরিসরে শাসনকার্য পরিচালনা নীতি ও এর কাঠামো সংস্কারের প্রেক্ষিতে দ্রুত ও সময়োপযোগী সাড়া প্রদান গুরুত্বের দাবি রাখে। তবে এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়েই আমরা, নিম্নস্বাক্ষরিত সংস্থাগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করছি। একইসঙ্গে এও মনে করছি যে, বাংলাদেশের অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার সম্প্রতি ডিজিটাল পরিসরে যে নীতি ও আইনি কাঠামো সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে তা পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা বা অংশগ্রহণমূলক পরামর্শ ব্যতীত নেওয়া হয়েছে। যা অনেকাংশেই সাধারণের কাছে অস্পষ্টতা তৈরি করেছে এবং গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। অনেকটা তাড়াহুড়ো করেই যেনো এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে; যা পূর্ববর্তী প্রশাসন বা সরকারের আইনি ব্যবস্থা ও শাসনকাঠামোরই প্রতিচ্ছবি।

এছাড়াও লক্ষণীয় যে, *সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (সিপিও)* এবং *ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ (পিডিপিও)*-এর খসড়া সামগ্রিকভাবে সাইবার পরিসরের বৃহত্তর সঙ্কটগুলো মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের বিদ্যমান সংবিধান ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোর অধীনে যে মৌলিক অধিকারের মানদন্ড রয়েছে সেটিও পূরণ করতে পারেনি। প্রস্তাবিত ওই অধ্যাদেশগুলো অনেকাংশেই সুনির্দিষ্ট নয়, অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে; পাশাপাশি জটিল শব্দবন্ধ ও বিধানের উপর নির্মিত। যা বিশেষ করে প্রান্তিক সম্প্রদায়, রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী, সাংবাদিক, অধিকার কর্মী এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ভুল ব্যাখ্যা, অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং অপব্যবহারের ঝুঁকি তৈরি করে।

আবার, ডিজিটাল পরিষেবা, বাজার ও সম্প্রদায়গুলো যেহেতু আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে বিস্তৃত; তাই বর্তমানের খসড়াগুলো আইনের শিষ্টাচার এবং আইনের সংঘাতের নীতি মেনে চলার বিষয়েও গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। বর্তমানে সংসদীয় প্রক্রিয়া এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষাব্যবস্থা স্থগিত থাকায়; স্বচ্ছতা, জন-জবাবদিহিতা এবং মানবাধিকারের বিষয়গুলো মেনে চলার বিষয়েও শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

খসড়া প্রক্রিয়ায় অস্বচ্ছতা ও কার্যকর জন-অর্ন্তভূক্তিতে বাধা

আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, প্রস্তাবিত কিছু সংস্কার, বিশেষ করে *সিপিও* এবং *পিডিপিও* বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিবেচনায় করা রয়েছে। যা এ বিষয়ে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্তিমূলক সম্পৃক্ততা, বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ এবং বিশ্বব্যাপী চর্চিত গ্রহণযোগ্য প্রমাণ-ভিত্তিক আইনী প্রণয়ন প্রক্রিয়াসহ; সামগ্রিক বিষয়গুলোকে অবজ্ঞা করে। সেদিক বিবেচনায়, *সিপিও* খসড়ার বিভিন্ন সংস্করণ; বহুল সমালোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ (ডিএসএ) এবং পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ (সিএসএ)-এরই প্রতিফলন ঘটায়। গত ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে জনসাধারণের মতামত বা পরামর্শের নিমিত্তে তিন দিনের জন্য খসড়া *সিপিও*-টি উন্মুক্ত করা হয় এবং এই অপর্যাপ্ত সময় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের ফলে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের

এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য গত ২২ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে শুরু করে আরও দুই সপ্তাহের জন্য সময় বাড়ানো হয়। এতদ্বসত্ত্বেও এই পরামর্শমূলক প্রক্রিয়াটি খসড়ার ভিতরে আনীত পরিবর্তনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি এ নিয়ে পূর্বে দেওয়া পরামর্শের গ্রহণযোগ্যতা ও ন্যায্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। উপরন্তু, *বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (বিটিআরএ)* সংশোধনের প্রস্তাব, যার আদলে সামগ্রিকভাবে নজরদারি, ফোনে আঁড়িপাতা এবং ইন্টারনেট বন্ধের মতো কর্মকান্ড চালানো হতো; তা এখনো জনসাধারণের ধরাছোয়ার বাইরেই/আড়ালেই রয়ে গেছে। ফলস্বরূপ, সমাজের সুশীল সংগঠনসমূহ, আইনী এবং সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়, ব্যবসায় প্রতিনিধিরা, প্রযুক্তিবিদরা, একাডেমিকরা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডাররা এই প্রস্তাবিত অধ্যাদেশগুলো পর্যালোচনা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। একইভাবে এসবের বৃহত্তর মানবাধিকার এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের তথ্যভিত্তিক কার্যকর মূল্যায়ন করতেও অপারগতা প্রকাশ করছে।

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশের অস্পষ্টতা ও ব্যাপক শর্তসাপেক্ষ বিধান: মৌলিক অধিকারের প্রতি হুমকি

বর্তমান খসড়াগুলি অস্পষ্ট, অনির্ধারিত এবং বিস্তৃত শর্তসাপেক্ষ বিধানের ওপর নির্ভর করে প্রণীত; যা যথাযথ প্রক্রিয়াগত সুরক্ষার কথা বিবেচনায় না নিয়েই করা হয়েছে। এতে বিশেষ করে প্রান্তিক সম্প্রদায়, রাজনৈতিক ভিন্নমতাবলম্বী, সাংবাদিক, অধিকার কর্মী এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে ভুল ব্যাখ্যা, অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ এবং অপব্যবহারের ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, 'অশ্লীল ভিডিও' প্রচার এবং 'যৌন হয়রানি' এর মতো শব্দগুলির কথা বলা যায়, যেখানে শাস্তির বিধান হিসেবে সর্বাধিক তিন বছরের কারাদণ্ডের উল্লেখ আছে। অথচ *সিপিও*-তে এ বিষয়গুলো সুনির্দিষ্ট নয়; বরং অস্পষ্টই রয়ে গেছে। অন্যদিকে, 'সাইবার সন্ত্রাসবাদ' বিষয়টিকে জটিল এবং অস্পষ্ট শর্তাবলীর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যেমন, জাতীয় অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখীন করার অভিপ্রায়ে ডিজিটাল সিস্টেম বা অবকাঠামোতে প্রবেশ বা বাধা প্রদান করা, জনসাধারণের মধ্যে ভয় সৃষ্টি করা, বিদেশী সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর বিবেচিত হলে, কোনো বিদেশী রাষ্ট্র বা ব্যক্তির জন্য লাভজনক হওয়া, এই ধরনের কর্মকান্ডের জন্য শাস্তিস্বরুপ দশ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। একইভাবে, 'ব্যক্তিগত তথ্য' শব্দটির সংজ্ঞায়ন; যা স্থান, সময় ও ব্যাখ্যাভেদে আলাদা হতে পারে তা *পিডিপিও*-তে অনির্ধারিত রয়ে গেছে।

প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক মতবাদ অনুসারে, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিত করে এমন আইনগুলি যথেষ্ট সুনির্দিষ্ট ও অনুমেয় হতে হবে। এছাড়াও এটি নিশ্চিত করতে হবে যে বিধিবদ্ধ ম্যান্ডেটগুলি একটি ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত, অ-বৈষম্যমূলক এবং অ-স্বেচ্ছাচারী পদ্ধতিতে পূর্বনির্ধারিত সীমার মধ্যে প্রয়োগ করা হয়; যাতে ব্যক্তিদের একটি স্পষ্ট আইনি মান থাকে যার বিপরীতে তারা তাদের কাজকর্ম মূল্যায়ন করতে পারে। বিশেষত, অধিকারের সীমাবদ্ধতা এবং অপব্যবহারের উপর *সিরাকুসা নীতিমালা* নিশ্চিত করে যে, মানবাধিকারের উপর হস্তক্ষেপকারী আইনগুলি স্পষ্ট এবং সহজলভ্য হতে হবে, অন্যদিকে *সাধারণ মন্তব্য নং ৩৪* এ বলা হয়েছে যে আইনগুলি 'যথেষ্ট নির্ভুলতার সাথে তৈরি করতে হবে যাতে একজন ব্যক্তি তার আচরণ সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ... [এবং] মত প্রকাশের স্বাধীনতা সীমিত করার জন্য নির্বাহী ব্যক্তিদের উপর অবাধ ক্ষমতা প্রদান করা যাবে না।' অনুরূপভাবে, *সাধারণ মন্তব্য নং ৩৫* নিশ্চিত করে যে অ-স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে যুক্তিসঙ্গতা, পূর্বাভাসযোগ্যতা, প্রয়োজনীয়তা এবং আনুপাতিকতার উপাদান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এমতাবস্থায়, আমরা উদ্বিগ্ন যে উপরিউক্ত আলোচিত বিধানগুলি *আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি (আইসিসিপিআর)*-এর ধারা ৯(৪) এবং ১৯(২) ও (৩),

মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার (ইউডিএইচআর) ধারা ১৯ এবং ২৯(২) এবং বাংলাদেশের সংবিধানের ধারা ২৬, ২৭, ৩১ এবং ৩৯(২) এর অধীনে নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে।

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে ব্যক্তির গোপনীয়তা-লঙ্ঘনকারী বিধান, মানবাধিকারের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তোলে

বর্তমান খসড়াগুলিতে একাধিক এমন বিধান রয়েছে–যা বিটিআরএ এবং ইন্টারনেট ও টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্সিং কাঠামোর অধীনে অবাধ নজরদারি, আঁড়িপাতা এবং তথ্য প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। যা নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকারকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করে।

উদাহরণস্বরূপ, *সিপিও*-তে এমন বিধান রয়েছে যেখানে পুলিশ কর্মকর্তাদেরকে অবাধে তল্লাশি ও কোনো কিছু জব্দ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কেবলমাত্র এমনটা মনে বা বিশ্বাস করেন যে, এ অধ্যাদেশের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে কিংবা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে তল্লাশি পরোয়ানা সাপেক্ষে তিনি সেই তথ্য উপাত্তে হস্তক্ষেপ ও কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম জব্দ করতে পারবেন। যা নিঃসন্দেহে অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও উদ্বেগের বিষয় হলো, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে কিছু ক্ষেত্রে কোনোরকম তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়াই শুধুমাত্র কাউকে সন্দেহের ভিত্তিতে তাকে তল্লাশি, গ্রেফতার ও তার সম্পত্তি জব্দ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এ অধ্যাদেশে বলা হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে সাইবার হামলা কিংবা কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ডিজিটাল ডিভাইসে বেআইনী প্রবেশের মাধ্যমে মুছে ফেলা, নষ্ট করা, সাক্ষ্যপ্রমাণাদি হারানোর সম্ভাবনা রয়েছে এমন বিশ্বাস থাকাসাপেক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি তল্লাশি পরোয়ানা ছাড়াই তল্লাশি, গ্রেফতার, জব্দ করতে পারবে। এমনকি এসব কাজে বাধা দিলে ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে সাইবার হামলা, সাক্ষ্যপ্রমাণাদি হারানোর সম্ভাবনা, সন্দেহের ভিত্তি এসব বিষয়গুলো অস্পষ্ট ও অসংজ্ঞায়িতই রয়ে গেছে; যা ব্যক্তির গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন করে। উপরন্তু এই অধীনে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানেরা তথ্য প্রকাশ করাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে বাধ্য; তবে এখানে সংবেদনশীল তথ্য সুরক্ষার বা সরকারি আধিপত্য প্রতিরোধের জন্য কোনো সুস্পষ্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থার সুযোগ নেই।

অনুরূপভাবে, *পিডিপিও*-তেও গোপনীয়তা সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতি রয়েছে। বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলিকে ব্যাপক ছাড় দেওয়ার মাধ্যমে; যারা ডেটা সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা থেকে কার্যকরভাবে বিরত রাখে। এই ধরনের প্রাধান্যকারী ছাড় বা প্রশ্রয়–উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা, ডেটা হ্রাসকরণ এবং সম্মতির মতো গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সুরক্ষা নীতিগুলিকে উপেক্ষা করে। পাশাপাশি কর্তৃপক্ষকে কোনোরকম সীমাবদ্ধতা বা বাধা ছাড়াই ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ, প্রক্রিয়া এবং সংরক্ষণ করার বৈধতা দেয়। এই ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ফাঁক-ফোঁকরের/শূন্যতার মাধ্যমে, *পিডিপিও* সরকার অনুমোদিত নজরদারিকে আরও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ রূপ দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করছে। যা ঐতিহাসিকভাবে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের মতো গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনমূলক কর্মকান্ডকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে। এছাড়াও, প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটি সকল উপাত্ত নিয়ন্ত্রক এবং প্রক্রিয়াকরণকারীদের তাদের সামগ্রিক উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রমের বিবরণসহ একটি সর্বজনীন প্রবেশযোগ্য নিবন্ধে নিবন্ধিত করার বাধ্যবাধকতা তৈরি করে। বিষয়টি স্বচ্ছতা জোরদারের উদ্দেশ্যে করা হলেও,, এই বিধানটি গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। বিশেষত সংবেদনশীল ব্যবহারকারীর উপাত্ত, ব্যবসায়িক গোপনীয়তা ও ব্যবসায়িক গোপন কার্যক্রম পরিচালনা করা, সাইবার আক্রমণ, গুপ্তচরবৃত্তি,

উদ্দেশ্যমূলক হয়রানির ঝুঁকি, সাংবাদিক, কর্মী এবং মানবাধিকার রক্ষাকারী সংস্থাগুলিকে ডিজিটাল পরিসরে হুমকির সম্মুখীন করে।

আমরা উদ্বিগ্ন যে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই বিধানগুলি অবাধ নজরদারি সৃষ্টি এবং *আইসিসিপিআরের* ধারা ১৭, *ইউডিএইচআরের ধারা* ১২ এবং বাংলাদেশের সংবিধানের *ধারা* ৪৩-এর অধীনে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের লঙ্ঘন ঘটাতে পারে।

আংশিক/খণ্ডিত সংস্কারমূলক উদ্যোগ, ডিজিটাল গভর্নেন্সের সামগ্রিক ব্যবস্থাকে দুর্বল করছে

সাইবার সুরক্ষা এবং উপাত্ত সুরক্ষার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও, আমরা উদ্বিগ্ন যে অন্যদিকে ডিজিটাল গভর্নেন্স এবং আইন সংস্কারের পদ্ধতি অনেকটা সংকীর্ণ, আংশিক এবং বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এই অত্যন্ত জটিল আইনগুলির প্রস্তাবিত যে পরিবর্তনগুলি আনা হয়েছে তা অনেকাংশে—ক্ষণস্থায়ী ব্যবস্থাকেন্দ্রিক এবং বিষয়ভিত্তিক সমাধান নির্ভর। যা বৃহত্তর পরিসরে ডিজিটাল অবমাননা ও সাইবার নিরাপত্তার হুমকির মূল কারণগুলি শণাক্ত ও মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, *শিশু আইন, ২০১৩*, *নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০* এবং *পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২*; নারী ও শিশুর ওপর হওয়া বৈষম্যমূলক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্ব দেয়। তবে শিশু যৌন নির্যাতন সামগ্রী এবং প্রযুক্তি-সহায়ক লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মতো বিষয়গুলো মোকাবিলা করার জন্য শক্তিশালী কোনো বিধান বা প্রয়োগের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। যদিও *সিপিও*-তে শিশু ও নারীদের বিরুদ্ধে হওয়া নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য বর্ধিত শাস্তির বিধান রয়েছে, তবুও দুর্বল প্রায়োগিক প্রক্রিয়া এবং বৃহত্তর সীমাবদ্ধতাসমূহ এর কার্যকারীতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। বিশেষ করে অনলাইন পরিসরের বাইরে সংঘটিত হওয়া সহিংসতা মোকাবেলায়। এক্ষেত্রে নতুন আইন তৈরি করার চেয়ে, বরং বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার পূর্বোক্ত আইনগুলো সংশোধন করে সম্ভাব্য ডিজিটাল ঝুঁকিগুলো চিহ্নিত করলে; এবং অনলাইন পরিসরে হওয়া সহিংসতা থেকে নারী ও শিশুদের জন্য সঠিক সমাধান পাওয়ার ব্যবস্থা করলে বেশি ভালো অবস্থানে থাকবে। সরকার বৃহত্তর বাজার এবং সেক্টর-ভিত্তিক কৌশল গ্রহণের পরিবর্তে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন/বিবর্জিত সমাধানের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায়; কাঠামোগত ত্রুটিসম্পূর্ণ-খণ্ডিত-অকার্যকর আইনি কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার ঝুঁকি নিচ্ছে। যা ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল বাজার ও পরিষেবার দ্রুত বিকাশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না।

সুপারিশমালা

আমরা, নিম্নস্বাক্ষরকারী সংগঠনসমূহ, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ডিজিটাল গভর্নেন্স সংস্কারের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিবেচনা করতে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশেষভাবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য যে, আইন বা অধ্যাদেশগুলো যেনো মানুষের অধিকারের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, জনগণের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয় এবং ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয়। এছাড়াও সে অধ্যাদেশগুলো যেন স্বচ্ছ, সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এবং নির্ভরযোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এটা নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ যে, এই অধ্যাদেশগুলি যেনো সংসদীয় আইনের বৈধ সীমার মধ্যে থাকে এবং জনগণের মৌলিক অধিকারগুলো রক্ষা করে হয়। বিশেষভাবে, আমরা সুপারিশ করি:

- বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ঘোষিত অভিপ্রায়ের সাথে সঙ্গতি রেখে সাইবার নিরাপত্তা আইন (CSA) বাতিল করাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিন বা প্রধান কাজ হিসেবে বিবেচনা করুন। এছাড়াও এই আইন ও এর পূর্বসূরি, ডিএসএ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬-এর ৫৭ ধারার অধীনে দায়ের করা সমস্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করুন।
- সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি সমাধানে একটি বিশেষ আইন বা অধ্যাদেশ গ্রহণ করুন এবং সেই সাথে অনলাইনে নিরাপত্তা ও উপাত্ত সুরক্ষাসহ বহু-মুখী এবং জটিল ডিজিটাল হুমকি কমাতে একটি পরামর্শমূলক কর্মপরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করুন।
- আইন প্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নজরদারি, আঁড়িপাতা ও ডেটা বা উপাত্তে প্রবেশ করার অবাধ ক্ষমতার বিপরীতে *বিটিআরএ* এবং *১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির* অধীনে স্পষ্ট আইনি ভিত্তি প্রবর্তন করতে হবে। যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের বাড়াবাড়ি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী পদ্ধতিগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।
- আইন তৈরি করার প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরামর্শ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে, আইনের খসড়া ও সংশোধনীগুলো যথেষ্ট সময় দিয়ে প্রকাশ করতে হবে যাতে জনগণ ভালোভাবে তাদের মতামত জানাতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামত নেওয়ার জন্য একটি কার্যকারী ফিডব্যাক সিস্টেম তৈরি করতে হবে এবং পরামর্শের ভিত্তিতে খসড়াগুলোতে যে পরিবর্তন আনা হবে, তার যৌক্তিক কারণও জানাতে হবে।
- সকল সংস্কার উদ্যোগ বা পদক্ষেপগুলো যেনো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার নীতির সাথে সঙ্গতি রেখে করা হয়। এছাড়াও এটা নিশ্চিত করতে যে মত প্রকাশের অধিকার, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ওপর যদি কোনো বাধা বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়; সেগুলো যেনো ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights), UDHR (Universal Declaration of Human Rights) এবং বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী যে নিয়ম ও মানদণ্ড আছে, তার আলোকে ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। বিশেষ করে, আমরা এই পরামর্শ দিচ্ছি যে আইনের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দগুলোর মানে যেনো পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলা হয়। অর্থাৎ আইনের মধ্যে থাকা অস্পষ্ট ও খুব বেশি বিস্তৃত নিয়ম বা ধারাগুলো বাদ দেওয়া। মৌলিক অধিকারগুলোর সুরক্ষার সাথে মিল রেখে সময়ে সময়ে আইনের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা (পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা) এবং নিরপেক্ষভাবে আইনের প্রভাব মূল্যায়ন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। আবার, এই নিয়ম বা আইনগুলো যেনো খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ডিজিটাল গভর্নেন্সের ভেতরের বা মূল কাঠামোর দুর্বলতাগুলো দূর করার জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সুসংহত নিয়ম বা উপায় অবলম্বন করুন। আলাদা আলাদা এবং বিশেষ সমস্যার জন্য বিশেষ তৈরিকৃত নিয়ম-কানুন থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। বরং, বিস্তৃত এবং সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে এমন কাঠামো তৈরি করতে হবে। যেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে ক্রেতাদের অধিকার রক্ষা, প্রতিযোগিতা, ইন্টারনেট নিরাপত্তা, প্ল্যাটফর্মের দায়বদ্ধতা, মেধাস্বত্ত্বের অধিকার, গোপনীয়তা রক্ষা, ডেটা বা তথ্যের নিরাপত্তা, দেশের সীমানা পেরিয়ে ডেটা আদান-প্রদান এবং নতুন প্রযুক্তিগুলোর নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়াদি। এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে যা হবে ভারসাম্যপূর্ণ; যেখানে অধিকারকে সম্মান এবং নতুন আইডিয়া বা উদ্ভাবনকে

উৎসাহিত করা হবে। একইসঙ্গে যা দেশের জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ দায়িত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম পরিচালনা করতেও সাহায্য করবে।

- এটা নিশ্চিত করতে হবে যে এই আইনগুলোর আওতায় যে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে, যেমন সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা, বাংলাদেশ ডেটা সুরক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে বা চাপমুক্ত হয়ে কাজ করবে। এছাড়া তারা যেনো কঠোর তত্ত্বাবধানের মধ্যে থাকে। তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে যেনো জবাবদিহি করতে হয় এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে। আবার, তাদের নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো, বিশেষ করে সেইগুলো যা সাধারণ মানুষের অধিকারের উপর প্রভাব ফেলে, তা অবশ্যই নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা উচিত।

অনুমোদিত ও স্বাক্ষরিত

- এক্সেস নাও
- আর্টিকেল নাইনটিন
- হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ
- পেন ইন্টারন্যাশনাল
- রবার্ট এফ. কেনেডি হিউম্যান রাইটস্
- টেক গ্লোবাল ইন্সটিটিউট